বাংলা ভাষার গতি

রাজশেখর বসু

বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড়শ বৎসর আগে, গদ্য রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যময়, তাতে নবরসের প্রকাশ হতে পারলেও সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হ'ত না। গদ্য বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিলাতী ইতিহাসে যেমন এলিজাবেথীয় ভিক্টোরীয় ইত্যাদি যুগ, সেই রকম বাংলা সাহিত্যিক ইতিহাসের কাল বিভাগের জন্য বলা হয় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনও প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয়নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র সাহিত্য শাসক ছিলেন, তাঁর আমলে লেখকরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, সেজন্য তৎকালীন সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যধিক প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনও রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের হানি হয়নি। তঁার তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের যে অংশ বহিরঙ্গ বা ভাষার আকৃতিগত তারই কিছু আলোচনা করছি।

চলতিভাষার প্রসার

চলতিভাষার লিখিত প্রথম গ্রন্থ বোধ হয়, হুতোম পেঁচার নক্‌শা। অনেক বলেন আলালের ঘরের দুলালও চলতিভাষায় লেখা। কথা ঠিক নয়, কারণ এই বইএ প্রচুর গ্রাম্য আর ফরাসী শব্দ থাকলেও সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের সাধুরূপই দেখা যায়। রেনল্ড্‌স - এর গল্প অবলম্বনে লিখিত হরিদাসের গুপ্তকথা নামক একটি বই পঞ্চাশ -ষাট বৎসর আগে খুব চলত। এই বই চলিতভাষায় লেখা কিন্তু তাতে মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমযুগের গল্পের নরনারী সাধুভাষায় কথা বতলত। তারপর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখক তাঁদের পাত্র-পাত্রীদের মুখে চলতিভাষা দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁরা নিজের বক্তব্য সাধুভাষাতেই লিখতেন। আরও পরে প্রথম চৌধুরীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্য রচনা চলিতভাষাতেই লিখতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তাই এখন চলিতভাষার প্রামাণিক বা স্ট্যান্ডার্ড রীতি রূপে গণ্য হয়।

আজকাল বাংলায় যা কিছু লেখা হয় তার বোধ হয় অর্ধেক চলিতভাষায়। সাধুভাষা এখন প্রধানত খবরের কাগজে,সরকারী বিজ্ঞাপনে, দলিলে আর স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়। অধিকাংশ গল্প এখন চলিতভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু সকলে এ ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি, তার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে। এখনও টিকে আছে, তার কারণ চলিতভাষায় যথেচ্ছাচার দেখে বহু লেখক তা পরিহার করে চলেন। 'বল্ল, দিলো, কোর্চ্ছে' প্রভৃতি অদ্ভুত বানান এবং 'কারকে, তাদেরকে, ঘরের থেকে' প্রভৃতি গ্রাম্য প্রায়োগ বর্জন না করলে চলিতভাষা সাধুর সমান দৃঢ়তা ও স্থিরতা পাবে না।

লেখকদের মনে রাখা আবশ্যক যে চলিতভাষা বা অন্য কোনও অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নয়,সাহিত্যের প্রয়োজনে উদ্ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional ভাষা। এই ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দিষ্ট ধাতুরূপ ও শব্দরূপ মানতে হবে এবং সাধুভাষার সঙ্গে বিস্তর রফা করতে হবে।

বানানের অসাম্য

বাংলা বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বিস্তর অভিযোগ পত্রিকাদিতে ছাপা হয়েছে। সকলেই বলেন, নিয়মবন্ধন দরকার। ঠিক কথা, কিন্তু কে নিয়মবন্ধন করলে লেখকরা তা মেনে নেবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ? বিশ্বভারতী? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ? প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথআর শরৎচন্দ্র সেই নিয়মাবলীতে স্বাক্ষর করে তাঁদের সম্মতি জানিয়েছিলেন। তারপর থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী মোটামুটি সেই বানানে ছাপা হচ্ছে, অনেক লেখকও তার কিছু কিছু অনুসরণ করে থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ লেখকই এইনিয়মগুলির কোন খররই রাখেন না, রাখলেও তাঁরা চিরকালের অভ্যাস বদলাতে চান না। আসল কথা, নিয়ম রচনাযিনিই কন, সকলের তা পছন্দ হবে না, লেখকরা নিজের মতেই চলবেন। বাঙালীর নিয়মনিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিকে নেতা বা ধর্মগুর আজ্ঞা ভেবে বাঙালী ভাবে আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনও যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না।

বাংলা বানানে সামঞ্জস্য শীঘ্র দেখা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। অ্যা, য়্যা, এ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বানান চলতে থাকবে, যাঁরা নূতনত্ব চায় তাঁরা 'বাংগ, আকাংখা, উচিৎ, কোরিলো, বিশেষতো' লিখবেন এবং দেদার ও-কার হস্-চিহ্ন অনর্থক যোগ করবেন। হিন্দীভাষী সোজাসুজি বানান করে লখনউ, কিন্তু বাঙালী তাতে তুষ্ট নয়, লেখে লক্ষ্ণৌ। অকারণ য-ফলা দিয়ে লেখে স্যার, অকারণ ও-কার দিয়ে লেখে পেলো। নিয়মবন্ধনে ফল হবে না। যত রকম বানান এখন চলেছে তার কতগুলি কালক্রমে বহুসম্মত ও প্রামাণিক গণ্য হয়ে স্থায়িত্ব পাবে, বাকীগুলি লোপ পাবে।

পূর্ববঙ্গের প্রভাব

সেকালে যখন সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ে বোঝা যেত না তাঁরা কোন জেলার লোক। কলকাতার রমেশচন্দ্র দত্ত, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চাটগাঁয়ের নবীনচন্দ্র সেন, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। তাঁদের রচনায় গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ না থাকায় ভাষার ভেদ হ'তনা। কিন্তু আজকাল চলিতভাষায় যা লেখা হয় তা পড়লে প্রায় বোঝা যায় লেখক পূর্ববঙ্গীয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয়। 'আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা, কেমন জানি (কেমন যেন), সুন্দর মতো' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু এসবই প্রয়োগ অশুদ্ধ নয়. অতএব বর্জনীয় বলা যায় না। পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত গুলি আর টা প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে -রা যোগ করেন। ('আকাশ হতে জলেরা ঝড়ে পড়ছে'), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক -কে বিভক্তি লাগান ('বইগুলিকে গুছিয়ে রাখা')। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সওয়া' (১ পৃন্য ১-এর ৪) স্থানে 'দেয়া' নেয়া সোয়া' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি', লেখেন। এই সব প্রয়োগও নিষিদ্ধ করা যাবে না। বিলাত আর মার্কিন দেশের ভাষা ইংরেজী কিন্তু অনেক নামজাদা লেখকের রচনায় ওয়েল্স স্কচ বা আইরিশ ভাষার ছাপ দেখা যায়, মার্কিন ইংরেজী অনেক সময় খাস ইংরেজের অবোধ্য ঠেকে। পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না।

তথাপি মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার সঙ্গেই সাহিত্যিক চলিত-ভাষার সাদৃশ্য বেশী। সকল লেখকই তাঁদের প্রাদেশিক সংস্কার পরিহার করে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। এতে কোনও জেলার গৌরব বা হীনতার প্রশ্ন ওঠে না, বিশেষত দৈববিপাকে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন সমস্ত বাঙালী হিন্দুর আশ্রয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেকসময় অজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর (এবং পশ্চিমবঙ্গেরও ককেটি জেলাবাসীর) লেখায় অপ্রামাণিক বানান এসে পড়ে, যেমন অস্থানে চন্দ্রবিন্দু বা যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব, ড় আর র-এর বিপর্যয়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তাঁর এক

বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন--- ঘাঁড়ে ফোঁড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। যোগেশচন্দ্র উত্তরে লেখেন-- আপনার ঘাড় আর ফে াড়ার চন্দ্রবিন্দু দেখিয়া আমি আরও কষ্ট পাইলাম। অনেকে 'চেইন, ট্রেইন, মেরেইজ ' (marriage)' লেখেন। এঁদের একজনের কাছে সুনেছি, 'চেন' লিখলে লিখলে 'চ্যান' পড়বার আশঙ্কা আছে, তার প্রতিষেধের জন্য ই দেওয়া দরকার। অ ারও কয়েকজন যুক্তি দিয়েছেন, খাস ইংরেজের উচচারণে ই-ধবনি আছে। এক ভাষার উচচারণ অন্য ভাষার বানানে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকাশ যায় না, অতএব কাছাকাছি বানানেই কাজ চালাতে হবে। 'চেইন' লিখলে সাধারণ পাঠকের মুখে ই- কার অত্যধিক প্রকট হয়ে পড়ে, সেজন্য 'চেন' লেখাই ইচিত। লেখকের মুখের ভাষায় প্রাদেশিক টান থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু লেখবার সময় সকলেরই সতর্ক প্রামাণিকবানান অনুসরণ করা উচিত।

শব্দ ও অর্থের শুদ্ধি

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের তুলনায় এখনকার লেখকরা বেশী ভুল করেন, যাঁরা বাংলায় এম. এ. পাস করেছেন তাঁরাও ব াদ যান না। সেকালে লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল, তাদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্য লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। একালে লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে। অশুদ্ধির একটি প্রধ ান কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা পূর্বের তুলনায় খুব কমে গেছে।

অনেকে বলে থাকেন, ভাষা ব্যাকরণের অধীন নয়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নিয়ম চালাবার দরকার নেই। এ কথা সত্যযে জীবিত ভাষা কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণের শাসন পুরোপুরি মানে না, স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে, সেজন্য কালে তার ব্যাকরণ বদলাতে হয়। শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দাবলী শব্দার্থ আর বাক্যরচনার রীতিও বদলায়। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যে সম্ বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা চলে না। ল্যাটিন গ্রীক যে অর্থে মৃতভাষা সংস্কৃত সে অর্থে মৃত নয়। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরও শব্দ নেওয়া হয় এবং ব্যাকরণের বিধি অনুসারে নূতন শব্দ তৈরি করা হয় শুধু বাংলা ভাষা নয়, আসামী ওড়িয়া হিন্দী মারাঠী গুজরাটী ভাষাও সংস্কৃত থেকে শব্দ নেয়। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার এবং শব্দরচনার চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে, অধিকাংশ চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে বাংলাভাষার অপুরনীয় ক্ষতি হবে। অধিকাংশ ভারতীয়ভাষা যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলী, শব্দের ব ানান আর অর্থ বিকৃত করলে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হবে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা দুর্বোধ হবে।

সজ্ঞানে শব্দের অপপ্রয়োগ করতে কেউ চায় না, কিন্তু মহামহা - পণ্ডিতের ভুল হতে পারে। প্রখ্যাতনামা নমস্য লেখকের ভুল হলে খাতির করে বলা হয় আর্ষ-প্রয়োগ, কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রামাণিক বলে গন্য হয় না। ভুল জানতে পারলে অনেকে তা শুধরে নেন, কিন্তু যাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তিনি ছাড়তে চান না। ভুল প্রয়োগের সমর্থনে অনেকসময় কুযুক্তি শোনা যায়। বাংলা 'চলন্ত' আর 'পাহারা' আছে কিন্তু অনেকে তাতে তুষ্ট নন,. সংস্কৃত মনে করে 'চলমান'আর 'প্রহরা' লেখেন। যখন শোনেন যে সংস্কৃত নয় তখন বলেন, বাংলা স্বাধীন ভাষা, সংস্কৃতের দাসী নয়; চলমান আর প্রহরা শ্রুতিমধুর, অতএব চলবে। 'কার্যকরী' শ্রীলিঙ্গ, কিন্তু বোধ হয় সুমিষ্ট, তাই 'কাযকরী উপায়, কার্যকরীপ্রস্তাব ' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়।

'কর্মসূত্র' স্থানে 'কর্মব্যপদেশে', 'ধূমজাল' স্থানে 'ধূম্রজাল', 'শয়িত' বা শয়ান স্থানে 'শায়িত', 'প্রসার' স্থানে 'প্রসারতা', 'কৌশল' বা পদ্ধতি অর্থে 'আঙ্গিক', 'প্রামাণিক' অর্থে 'প্রামাণ্য', 'ক্ষীণ' বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ অ াধুনিক রচনায় প্রচুর দেখা যায়। এইসব শব্দের বদলে শুদ্ধ শব্দ লিখলে রচনার মিষ্টত্বের লেশমাত্র হানি হয় না। ভাষার শুদ্ধিরক্ষার জন্য সতর্কতা আবশ্যক--- এ কথা শুনলে নিরঙ্কুশ লেখকরা খুশী হন না। তাঁদের মনোভাব বোধ হয় এই--- য া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আর পাঁচজনেও যা লিখছে তা অশুদ্ধ হলেও মেনে নিতে হবে। আমি যদি গলা - ধাক্কা অর্থে গলাধঃকরণ লিখে ফেলি এবং আমার দেখাদেখি অন্যেও তা লিখতে আরম্ভ করে তবে সেই নূতন অর্থই মানতে হবে।

ইংরেজীর প্রভাব

ইংরেজী অতি সমৃদ্ধ ভাষা। মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য সাবধানে ইংরেজী থেকে শব্দ আর ভাব আহরণ করলে কোনও অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যা আমাদের আছে তা অবহেলা করে যদি বিদেশী শব্দ বা বাক্যের নকল চালানো হয়, তবে অনর্থক দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং মাতৃভাষা বিকৃত হবে। প্লন্দ্বস্তুন্ত্বপ্প -এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম' -এর প্রয়োজন আছে, যথাস্থানে তার প্রয়োগ সার্থক। কিন্তু ইংরেজি বাক্যরীতির অনুকরণে লেখা হয়---'বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা।' 'বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা' লিখলে হানি কি ? সম্প্রতি দেখেছি--- 'এই সভায় অনেক ব্যক্তিত্বর সমাগম হয়েছিল'। ইংরেজি personality -এর আক্ষরিক অনুবাদ না করে 'বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম' লিখলে কি চলত না ? Promise আর signature -এর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'--এর অপ্রয়োগ আজকাল খুব দেখা যায়। 'নারীমাত্রে' মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন।' 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।' একজনের লেখায় দেখেছি---'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থাৎ took no notice)। এই রকম অন্ধঅনুকরণ যদি চলতে থাকে তবে বাংলা শীঘ্রই একটা উৎকট ভাষায় পরিণত হবে।

উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর

নীরদ চৌধুরীর বহু বিতর্কিত ইংরেজী বই-এ রকম একটা কথা আছে--- বাঙালী বিনা আড়ম্বরে কিছু লিখতে পারে না। যুদ্ধ বেধেছে, এই সোজা কথার বদলে লিখবে--দ্র তাঁর প্রলয়নাচন নাচতে আরম্ভ করেছেন। চৌধুরী মহাশয় কিছু অত্যুক্তি করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বাংলা কাগজে আগুন লাগা বা অগ্নিকাণ্ডর খবর লেখা হয়-- বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা। জলে ডুবি বা জলমজ্জনকে বলা হয় সলিল সমাধি। 'ব্যর্থ হইল' লিখলে যথেষ্ট হয় না, লেখা হয়-- 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।' বাংলাভাষী স্থানে লেখা হয় 'বাংলা - ভাষাভাষী।' সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে অনেকে পারেন না।

বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা অনর্থকর। বক্তব্য সহজে বোঝা যাবে মনে করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন। ---'কোষ্ঠকাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কাজ করে।' 'যে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, তত রকম ভাবে এক একটা আলো কণার থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে।' যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার করে স্পষ্টতা আর শৃঙ্খলিত যুক্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে। যাঁরা স্কুল কলেজের জন্যবিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের সেরকম চেষ্টা না করাই ভাল।*

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com